সারেং বৌ উপন্যাসে এক নারীর অন্তহীন সংগ্রাম এবং লালসালু উপন্যাসে এক ধর্মীয় গোঁড়ামীর চরম সমাজ-বাস্তবতা



**সারেং বৌ উপন্যাসঃ**

শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৮ সালে নির্মিত হয় চলচ্চিত্র ‘সারেং বউ’।

এদেশের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমিউনিস্ট পাটর্ির বিশিষ্ট সদস্য ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার উপন্যাসটি লেখেন ১৯৬১ সালে। সে সময় তিনি পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানবিরোধী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।

নোয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চলের এক নারীর জীবনযুদ্ধের দলিল 'সারেং বউ'। উপকূলীয় এক গ্রামের সহজ সরল মেয়ে নবিতুন। এক বৃদ্ধ সারেংয়ের মেয়ে সে। তার বাবার বন্ধু মদন সারেংয়ের ছেলে কদম সারেং জাহাজের চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামে ফেরে। কদম সারেংয়ের বাবা-মা মারা গেছে। সেই এখন সারেংবাড়ির বড় ছেলে। চাচা তার অভিভাবক।

তরুণ কদম সারেং নতুন করে মুগ্ধ হয় সদ্য তরুণী নবিতুনকে দেখে। ছোটবেলা থেকেই তারা পরস্পরের পরিচিত। নতুন করে তাদের প্রেমের সূচনা হয়। পরিবারের সকলের সম্মতিতে বিয়ে হয় তাদের।

নবিতুন চায় জাহাজের চাকরি ছেড়ে গ্রামেই কৃষিকাজ করুক কদম। কিন্তু নাবিকের রক্ত বইছে কদমের ধমণীতে। সমুদ্র তাকে ডাকে। সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না কদম।

নতুন বউ ফেলে জাহাজের চাকরিতে চলে যায় সে। যাবার আগে বাড়ির আঙিনায় সে একটি বড়ই গাছের চারা লাগিয়ে রেখে যায়। সেই গাছটি বড় হতে থাকে। সেই গাছের দিকে তাকিয়ে স্বামীর ফেরার পথ চেয়ে থাকে সারেং বাড়ির বউ নবিতুন। জন্ম হয় তাদের মেয়ের। বাবার স্নেহ ছাড়াই বড় হয়ে উঠতে থাকে মেয়েটি।

বিদেশ থেকে কয়েক মাস টাকা ও চিঠি পাঠায় কদম। গ্রামের মোড়ল লন্দুর চোখ পড়ে সুন্দরী নবিতুনের দিকে। নবিতুন তাকে পাত্তা দেয় না। বরং অপমান করে। কুপ্রস্তাব দিয়ে এক ‘গুজা বুড়ি’কে বারে বারে পাঠায় মোড়ল। তাকে তাড়িয়ে দেয় নবিতুন। পোস্টমাস্টারকে হাত করে কদমের পাঠানো টাকা ও চিঠি লুকিয়ে ফেলতে থাকে মোড়ল। চরম অভাবে পড়ে নবিতুন। মোড়ল মনে করে দরিদ্র নবিতুন এবার হয়তো তার কুপ্রস্তাবে রাজি হবে। কিন্তু ঢেঁকিতে ধান ভেনে বহু কষ্টে নিজের ও মেয়ের অন্ন জোগাড় করে সে। চাচাতো ননদ শরবতি সাহায্য করে নবিতুনকে। তারসঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলে সে।

গঞ্জে ধানের কল বসে। ঢেঁকি ছাঁটা চালের আর কদর নেই। যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী রূপের কাছে আরো অসহায় হয়ে পড়ে শ্রমজীবী নবিতুন।সারেং বাড়ির বউ হয়ে অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতে সম্মানে বাধে তার। তবু বেঁচে থাকার তাগিদে এবার চৌধুরি বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করতে থাকে নবিতুন। চৌধুরি বাড়ির ছোট বউ তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু সেখানেও বিপদ। দুশ্চরিত্র ছোট চৌধুরি, তার দিকে লোভের হাত বাড়াতে থাকে। বহুকষ্টে নিজেকে রক্ষা করে চলে সে। শাপলা ও শাক পাতা খেয়ে দিন চলে মা-মেয়ের ।

এদিকে কদমের দিন কাটে সমুদ্রে ও বিদেশের বন্দরে বন্দরে। সেখানে যৌনকর্মীদের সঙ্গসুখের প্রলোভন। কিন্তু নবিতুনকে ছুঁয়ে করা প্রতিজ্ঞার কথা ভোলে না কদম। সে বিশ্বস্ত থাকে স্ত্রীর প্রতি।

জাহাজের অনেক নাবিক নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে চোরাচালানী করে অনেকেই ধনী হয়, অনেকে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কদম সৎ মানুষ। সে এসব অপরাধের সঙ্গে জড়ায় না। তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী, বাবার বন্ধু মন্টু সারেং অবৈধ পাচারের সঙ্গে জড়িত। গোপনে সে কদমের পকেটে অবৈধ দ্রব্য রেখে দেয়। যাতে তার মাধ্যমে বন্দরের বাইরে জিনিষটি পাচার করতে পারে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নিরপরাধ কদম। বিদেশের জেলে বন্দি হয় সে।

নবিতুন এসবের কিছুই জানতে পারে না। কদমের উপর অভিমানে তার বুক ভরে থাকে। তবু সাহসী নবিতুন সব প্রতিকূলতাকে জয় করে একা থাকে।

কদম জেল থেকে ছাড়া পেয়ে টাকা পাঠায় গ্রামে। কিন্তু আগের মতোই টাকা লুকিয়ে ফেলে ডাকপিয়ন।

পাটক্ষেতে নবিতুনকে একা পেয়ে ধর্ষণ করতে চায় লন্দু মোড়ল। নবিতুন প্রাণপণে তাকে কামড় দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে।

দীর্ঘদিন ধরে কদম বিদেশে। তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। সারেং বাড়ির বউ হয়ে নবিতুন চৌধুরি বাড়িতে বাঁদীর কাজ করে। এতে পরিবারের মানসম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই চাচা শ্বশুর ও লন্দু মোড়ল সালিশ বসায়। গ্রামের পারিবারিক বৈঠকে স্থির হয় কদমের চাচাতো ভাই কোরবানের সঙ্গে বিয়ে হবে নবিতুনের। এই প্রস্তাবে রাজি না হলেও তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। লন্দু মোড়ল কোরবানকে গোপনে বোঝায় বিয়ের পর সে শুধু একবার নবিতুনকে তালাক দেবে তাহলে তাকে হিল্লা বিয়ে করতে পারবে লন্দুমোড়ল এবং শোধ নেবে নবিতুনের প্রত্যাখ্যানের। বিনিময়ে কোরবানকে গঞ্জের হাটে দোকান করে দেবে সে।

নবিতুনের আপত্তি কেউ শোনে না। বিয়ের দিন স্থির হয়। সেই সময় গ্রামে ফেরে কদম। নবিতুন নতুন সুখের সম্ভাবনা দেখে। কিন্তু গ্রামের মোড়ল ও কুচক্রী মানুষ কদমের কানে কুমন্ত্রণা দেয়। তাকে বলে নবিতুনের গর্ভে যে সন্তান তা অন্য মানুষের, কদমের নয়। সন্দেহের বিষে জ্বলে ওঠে কদম। নবিতুনের কষ্ট যেন আরো বেড়ে যায়। যে স্বামীর জন্য তার এতদিনের সংযম ও প্রতীক্ষা সেই স্বামীই তাকে সন্দেহ করে। তাকে তালাক দিতে চায়। গর্ভস্থ শিশুটির মৃত্যু হয় কদমের লাথিতে।

এদিকে প্রকৃতিও যেন আঘাত হানতে উদ্যত হয় জনপদের ওপর। সাইক্লোন ধেয়ে আসে উপকূলে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষের গড়া সভ্যতার চিহ্ন। প্রবল ঝড়ে ও বানে ভেসে যায় কদম ও নবিতুন। মৃত্যু হয় মেয়ে আক্কির। লন্দু মোড়লের মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে।

সারা রাতের সাইক্লোনের পর শান্ত হয় প্রকৃতির রুদ্র রোষ। নবিতুন নিজেকে আবিষ্কার করে এক চরের মধ্যে। কাঁদার ভিতর সে পড়ে আছে। বানের পানিতে ভেসে এসেছে সে এখানে।চারিদিকে মানুষ ও পশুর লাশ। একটু পরে সে শোনে কাঁদায় পড়ে পানি পানি করে আর্তনাদ করছে মৃতপ্রায় কদম। নবিতুন তাকে জলপান করালে সাগরের লোনা পানি থুথু করে ফেলে দেয় সে। খাবার পানির সন্ধানে এদিক ওদিক খোঁজে সে। কিন্তু কোথায় পাবে। শেষ পর্যন্ত স্তনদুগ্ধ দিয়ে কদমের তৃষ্ণা মেটায় সে, তার প্রাণ বাঁচায়। চেতনা ফিরে পেয়ে হাহাকার করে ওঠে কদম। বলে ‘আমারে পর কইরা দিলি বউ?” কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাদের মধ্যে আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। এবার বলিষ্ঠ কণ্ঠে নবিতুন বলে জান বাঁচানো ফরজ। সে ভেঙে ফেলে প্রচলিত ঘুণে ধরা সংস্কারের বেড়াজাল। নতুন চরের বুকে নতুন সূর্য ওঠে। নতুন জীবনের, নতুন সমাজের ইশারা নিয়ে আসে সেই সূর্য। অতীতের সব জঞ্জাল ও কদর্য স্মৃতি মুছে ফেলে নবিতুন ও কদম এগিয়ে চলে নতুন সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিযে।

এই এপিকধর্মী কাহিনিচিত্রটি পরিচালনা করেন আবদুল্লাহ আল মামুন। সংগীত পরিচালক ছিলেন আলম খান। গীতিকার মুকুল চৌধুরী। কণ্ঠশিল্পী ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন, রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার। এ ছবির ‘ওরে নীল দরিয়া’ বাংলা চলচ্চিত্রের চির সবুজ গানের তালিকায় রয়েছে।

সংগ্রামী নারী নবিতুনের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন কবরী। তার আনন্দ, বেদনা, হতাশা ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টাকে পর্দায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি। কদম সারেং চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেন ফারুক। লন্দু মোড়লের চরিত্রে ছিলেন আরিফুল হক। অন্যান্য চুরিত্রে অভিনয় করেন গোলাম মোস্তফা, জহিরুল হক, নাজমুল হুদা বাচ্চু, বাবর, দারাশিকো, নার্গিস, মিনু রহমান প্রমুখ।

ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে যেমন দারুণ সফল হয় তেমনি সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। এ ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান কবরী।

‘সারেং বউ’ উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উঠে আসে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে নারীর সংগ্রামের বহুমুখী চিত্র। আবার নারীর পাশে দাঁড়ানো অন্য নারীর সহমর্মিতার ছবিও দেখা যায়। চৌধুরি বাড়ির ছোট বউ ধনী ঘরের হলেও সে নির্যাতিত এবং নিরুপায়। তবু শরবতি ও ছোটবউ দাঁড়ায় নবিতুনের পাশে। অন্যদিকে পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে নিষ্পেশন করে বিভিন্ন কৌশলে। তাকে উপার্জন ও চলাচলের স্বাধীনতা দেয় না, তাকে রাখতে চায় নিজের নিয়ন্ত্রণে। নারীর মতও কেউ গ্রাহ্য করে না। যখন তাকে সে মুঠোয় পুরতে পারে না তখন তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এমনকি প্রিয় পুরুষটিও তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তবু নারী পরাজিত হয় না। নারী পৃথিবীতে নিয়ে আসে নতুন জীবন, গড়ে তোলে নতুন সমাজ।(সংগৃহীত)

## **লালসালু উপন্যাস এবং এর বিষয়বস্তু  :**

লালসালু হচ্ছে লাল রঙের কাপড়। এমনিতে লাল কাপড়ের তেমন কোনো মহিমা নেই। তবে এটি খুব উজ্জ্বল রং হওয়ায় একে বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী যুগ-যুগ ধরে লাল রং টিকে সফলভাবে কাজে লাগিয়ে আসছে। কবরের উপর লাল কাপড় বিছিয়ে দিলে কবরের গুরুত্ব অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন তা আর সাধারণ কবরে সীমাবদ্ধ থাকে না\_মাজারে পরিণত হয়। কবরটি তখন মানুষের ভক্তি প্রীতির আকর্ষণ হয়ে দাড়ায়। এ ধরনের কবরে মানুষ প্রতিনিয়ত ভিড় জমায়, জেয়ারত করে, দোয়া দরুদ পড়ে এবং শিরনি দেয়। টাকা পয়সা দেয়। এভাবে মাজারটি হয়ে দাড়ায় পরলোক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। এই

মাজার বাংলাদেশের লোকজীবনে অসামান্য প্রভাব

ফেলে। এখানেই ‌লালসালু নামকরণের তৎপর্য

ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। এরসাথে পীর-ফকিরদের সম্পর্ক

অত্যন্ত নিবিড়। উপন্যাস যখন লেখা হয়- তখন

চলছে দেশভাগের প্রস্তুতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগোত্তর উদ্বাস্তু সমস্যা আর সঙ্গে নতুন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দীপনা। এমনি একটা সময়ে ঔপন্যাসিক পটভূমি থেকে শুরু করে চরিত্র নির্বাচন; সবই নিলেন গ্রামীণ জীবন থেকে।

কাহিনীর বিষয়বস্তু সমাজ-চরিত্র :

একদিকে কুসংস্কারগ্রস্ত ধর্মভীরুশোষিত গ্রামবাসী, অন্যদিকে শঠ, ধর্ম-ব্যবসায়ী ও শোষক ভূস্বামী। কিন্তু লালসালু ঘটনাবহুল উপন্যাস নয়। ঘটনার চেয়ে ঘটনা

বিশ্লেষণের বিস্তারটাই চোখে পড়ে আগাগোড়া।

মূল চরিত্র মজিদ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে ঘিরেই

উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত। তারপর মহব্বতনগর

গ্রামের অধিবাসীদের মাজার কেন্দ্রিক ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা ওআকাঙ্ক্ষা\_সব নিয়ন্ত্রণ করে মজিদ। তার চক্রান্তেই নিরুদ্দেশ হয় তাহের ওকাদেরের বাপ। আওয়ালপুরের পীরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে সে পীরকেও করে পরাভূত। খালেক ব্যাপারীর প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ানো, যুবক আব্বাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে বিদ্রূপ করা ও তাকে অধার্মিক হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রামছাড়া করা\_এসবের মধ্য দিয়েই নিজের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা নিরঙ্কুশ বিস্তার করে, সে দ্বিতীয় বিয়ের পিড়িতে বসে। নতুন বউয়ের নাম জমিলা। চঞ্চল, সহজ-সরল মেয়ে। কিন্তু প্রথম থেকেই মজিদকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারে না সে। মজিদ

জমিলাকে শাসন করতে চায়; কিন্তু পারে না। জমিলার থুথু নিক্ষেপের ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয় সে। জমিলাকে মাজার ঘরের অন্ধকারে খুঁটিতে বেঁধে রাখে। শুরু হয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, কিন্তু 'রহীমার হৃদয় ব্যাকুল হয়। মজিদের প্রতি যে রহীমার বিশ্বাস ছিল পর্বতের মতো অটল এবং ধ্রুবতারার মতো অনড়' সে রহীমাই করে বিদ্রোহ। বোঝা যায়, মজিদের প্রতিষ্ঠার ভিতে ফাটল ধরেছে। প্রতীকের মাধ্যমে জমিলার লাশের পা মাজারকে যে আঘাত করে তা সমাজের কপালে কলঙ্কলেপনেরই সামিল। শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে

গ্রামবাসী মজিদের কাছে প্রতিকার চায়। কিন্তু

মজিদের কাছ থেকে ধমক ছাড়া তখন আসে না কিছুই

'নাফরমানি করিও না,খোদার ওপর তোয়াক্কেল রাখো।' এভাবেই বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন, বিধ্বস্ত ফসলের ক্ষেত এবং দরিদ্র গ্রামবাসীর হাহাকারের মধ্যদিয়ে লালসালু উপন্যাসের কাহিনী শেষ হয়। মজিদ কুসংস্কার, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক। প্রথাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়, প্রভু হতে চায়, চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে। প্রতারণা করে সজ্ঞানে। সে ঈশ্বর- বিশ্বাসীও। কিন্তু মাজারটিকে সেনটিকিয়ে রাখতে চায় যেকোনো মূল্যে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মকে পুঁজি করে সে নামে এক ব্যবসায়। তাই সেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার খিলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে সে স্পষ্ট বোঝে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দুবেলা খেয়ে বাঁচার জন্য যে খেলা খেলতে যাচ্ছে সে সাংঘাতিক। বাংলা কথাসাহিত্যে লালসালু একটি প্রথাবিরোধী উপন্যাস। ধর্মকে যারা স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে বা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, লালসালু উপন্যাসে সেই ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একটি জোরালো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে মজিদ নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের যে ব্যক্তিগত লড়াই এবং তার অস্তিত্বের জন্য বা টিকে থাকার জন্য তার যে নিরন্তর সংগ্রাম; সেটিকেও সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ তার উপন্যাসে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিয়ে এসেছেন। পীরের বাড়িতে একটা মেয়ের স্বাভাবিকভাবে পর্দানশিন থাকার কথা। যেমনটা দেখা গেছে, প্রথম বউ রহিমার ক্ষেত্রে। স্বামী মজিদের প্রতিটি কথাতার কাছে অবশ্য পালনীয়। কোথাও কোনো নড়চড় নেই। মজিদের কোনো ধূর্ততা, শঠতা, ভণ্ডামি কোনোটাই তার চোখে পড়ে না। অন্যদিকে জমিলা একেবারেই উল্টো পথে চলে।

‘লালসালু’ উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’। রচনাটিকে একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করা হয়। ঢাকা ও কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন তখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির ও চঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, আবার নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ে তোলার উদ্দীপনা ইত্যাদি নানা রকম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবর্তে মধ্যবিত্তের জীবন তখন বিচিত্রমুখী জটিলতায় বিপর্যস্ত ও উজ্জীবিত। নবীন লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, এই চেনা জগৎকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাসের জন্য গ্রামীণ পটভূমি ও সমাজ-পরিবেশ বেছে নিলেন। আমাদের দেশ ও সমাজ মূলত গ্রামপ্রধান। এদেশের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। এই বিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন দীর্ঘকাল ধরে অতিবাহিত হচ্ছে নানা অপরিবর্তনশীল তথাকথিত অনাধুনিক বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে। এই সমাজ থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের পটভূমি, বিষয় এবং চরিত্র। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ; বিষয় সামাজিক রীতি-নীতি, ও প্রচলিত ধারণা বিশ্বাস, চরিত্রসমূহ একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত, দরিদ্র গ্রামবাসী, অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী এবং শোষক-ভূস্বামী।

‘লালসালু’ একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। এর বিষয় : যুগ-যুগ ধরে শেকড়গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী মজিদ প্রতারণাজাল বিস্তারের মাধ্যমে বিভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তারই বিবরণে সমৃদ্ধ ‘লালসালু’ উপন্যাস। কাহিনিটি ছোট, সাধারণ ও সামান্য; কিন্তু এর গ্রন্থনা ও বিন্যাস অত্যন্ত মজবুত। লেখক সাধারণ একটি ঘটনাকে অসামান্য নৈপুণ্যে বিশেষণী আলো ফেলে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

শ্রাবণের শেষে নিরাক-পড়া এক মধ্যাহ্নে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের নাটকীয় দৃশ্যটির মধ্যেই রয়েছে তার ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচয়। মাছ শিকারের সময় তাহের ও কাদের দেখে যে, মতিগঞ্জ সড়কের ওপর একটি অপরিচিত লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে পাথরের মূর্তির মতোন দাঁড়িয়ে আছে। পরে দেখা যায়, ওই লোকটিই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত গ্রামের মানুষকে তিরস্কার করছে, ‘আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?’ অলৌকিকতার অবতারণা করে মজিদ নামের ওই ব্যক্তি জানায় যে, পিরের স্বপ্নাদেশে মাজার তদারকির জন্যে তার এ গ্রামে আগমন। তার তিরস্কার ও স্বপ্নদেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধায় এমন বিগলিত হয় যে তার প্রতিটি হুকুম তারা পালন করে গভীর আগ্রহে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড়সংলগ্ন কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করা হয়। ঝালরওয়ালা লালসালুতে ঢেকে দেওয়া হয় কবর। তারপর আর পিছু ফেরার অবকাশ থাকে না। কবরটি অচিরেই মাজারে এবং মজিদের শক্তির উৎসে পরিণত হয়। যথারীতি সেখানে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বলে; ভক্ত আর কৃপাপ্রার্থীরা সেখানে টাকা পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন। কবরটি এক মোদাচ্ছের পিরের বলে শনাক্তকরণের মধ্যেও থাকে মজিদের সুগভীর চাতুর্য। মোদাচ্ছের কথাটির অর্থ নাম-না-জানা। মজিদের স্বগত সংলাপ থেকে জানা যায়, শস্যহীন নিজ অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে-পড়া মজিদ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসলে এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা এ দেশের গ্রামাঞ্চলে বহুঁকাল ধরে বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ্রামীণ সমাজের একটু গুরুত্বপূর্ণ দিক যথাযথভাবেই এখানে তুলে ধরেছেন।

মাজারের আয় দিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মজিদ ঘরবাড়ি ও জমিজমার মালিক হয়ে বসে এবং তার মনোভূমির এক অনিবার্য আকাঙ্ক্ষায় শক্ত-সমর্থ লম্বা চওড়া একটি বিধবা যুবতীকে বিয়ে করে ফেলে। আসলে স্ত্রী রহিমা ঠান্ডা ভীতু মানুষ। তাকে অনুগত করে রাখতে কোনো বেগ পেতে হয় না মজিদের। কারণ, রহিমার মনেও রয়েছে গ্রামবাসীর মতো তীব্র খোদাভীতি। স্বামী যা বলে, রহিমা তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। রহিমার বিশ্বাস তার স্বামী অলৌকিক শক্তির অধিকারী। প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে মজিদ ধর্মকর্মের পাশাপাশি সমাজেরও কর্তা-ব্যক্তি হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপদেশ নির্দেশ দেয়- গ্রাম্য বিচার-সালিশিতে সে-ই হয়ে ওঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধান ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে মাতব্বর খালেক ব্যাপারীই তার সহায়ক শক্তি। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে থাকে সে। তাহেরের বাপ-মার মধ্যেকার একান্ত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে তাহেরের বাপের কর্তৃত্ব নিয়েও সে প্রশ্ন তোলে। নিজ মেয়ের গায়ে হাত তোলার অপরাধে হুকুম করে মেয়ের কাছে মাফ চাওয়ার এবং সেই সঙ্গে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি দেয়ার। অপমান সহ্য করতে না পেরে তাহেরের বাপ শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়। খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান প্রথম স্ত্রী আমেনা সন্তান কামনায় অধীর হয়ে মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী পিরের প্রতি আস্থাশীল হলে মজিদ তাকেও শাস্তি দিতে পিছপা হয় না। আমেনা চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে মজিদ। কিন্তু তবু মাজার এবং মাজারের পরিচালক ব্যক্তিটির প্রতি আমেনা বা তার স্বামী কারুরই কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় না।

গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক পশ্চাৎপদ জীবন ধারা থেকে সরে যেতে না পারে, সে জন্য সে শিক্ষিত যুবক আক্কাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। মজিদ এমনই কুট-কৌশল প্রয়োগ করে যে আক্কাস গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রাম, সমাজ ও মানুষের বাস্তব-চিত্র ‘লালসালু’ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটি শিল্পিত সামাজিক দলিল হিসেবে বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন।

‘লালসালু’র প্রধান উপাদান সমাজ-বাস্তবতা। গ্রামীণ সমাজ এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থবির, যুগযুগ ধরে এখানে সক্রিয় এই অদৃশ্য শৃঙ্খল। এখানকার মানুষ ভাগ্য ও অলৌকিকত্ব গভীরভাবে বিশ্বাস করে। দৈবশক্তির লীলা দেখে নিদারুণ ভয় পেয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখে নয়তো ভক্তিতে আপ্লুত হয়। কাহিনির উন্মোচন-মুহূর্তেই দেখা যায়, শস্যের চেয়ে টুপি বেশি। যেখানে ন্যাংটো থাকতেই বাচ্চাদের আমসিপারা শেখানো হয়। শস্য যা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সুতরাং ওই গ্রাম থেকে ভাগ্যের সন্ধানে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে-গ্রামে গিয়ে বসতি নির্মাণ করতে চায় সেই গ্রামেও একইভাবে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের জয়-জয়কার। এ এমনই এক সমাজ যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবলই শোষণ আর শোষণ-কখনো ধর্মীয়, কখনো অর্থনৈতিক। প্রতারণা, শঠতা আর শাসনের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শেকড় জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পরতে পরতে ছড়ানো। আর ওই সব শেকড় দিয়ে প্রতিনিয়ত শোষণ করা হয় জীবনের প্রাণরস। আনন্দ, প্রেম, প্রতিবাদ, সততা- এই সব বোধ এবং বুদ্ধি ওই অদৃশ্য দেয়ালে ঘেরা সমাজের ভেতরে প্রায়শ ঢাকা পড়ে থাকে। এই কাজে ভূস্বামী, জোতদার এবং ধর্মব্যবসায়ী একজন আর একজনের সহযোগী। কারণ স্বার্থের ব্যাপারে তারা একাট্টা-পথ তাদের এক। একজনের আছে মাজার, অন্যজনের আছে জমিজোত প্রভাব প্রতিপত্তি। দেখা যায়, অন্য কোথাও নয় আমাদের চারপাশেই রয়েছে এরূপ সমাজের অবস্থান। বাংলাদেশের যে-কোনো প্রান্তের গ্রামাঞ্চলে সমাজের ভেতর ও বাইরের চেহারা যেন এরূপ একই রকম।

আবার এই বদ্ধ, শৃঙ্খলিত ও স্থবির সামাজিক অবস্থার একটি বিপরীত দিকের চিত্রও আছে। তা হলো, মানুষের প্রাণধর্মের উপস্থিতি। মানুষ ভালোবাসে, স্নেহ করে; কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনার কারণে সে নিজেকে আলোকিত ও বিকশিত করতে চায়। সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভয়ের বাধা ছিন্ন কের সহজ প্রাণধর্মের প্রেরণোয় আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে চায়। কোনো ক্ষেত্রে যদি সাফল্য ধরা নাও দেয় তবু কিন্তু স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকে। প্রজন্ম পরম্পরায় চলতে থাকে তার চাওয়া ন-পাওয়ার সাংঘর্ষিক রক্তময় হৃদয়ার্তি। এটা অব্যাহত থাকে মানব সম্পর্কে মধ্যে, দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে, এমনকি ব্যক্তি ও সমষ্টির মনোলোকেও।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মানবতাবাদী লেখক। মানব-মুক্তির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রে সক্রিয়। এ দেশের মানুষের সুসংগত ও স্বাতঃস্ফূর্ত বিকাশের অন্তরায়গুলিকে তিনি তাঁর রচিত সাহিত্যের পরিমণ্ডলেই চিহ্নিত করেছেন; দেখিয়েছেন কুসংস্কারের শক্তি আর অন্ধবিশ্বাসের দাপট। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সমাজ সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও ভীতির মধ্যে রেখে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়েছেন ‘লালসালু’ উপন্যাসে। ধর্মবিশ্বাস কিন্তু তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য নয়-তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্ম ব্যবসায় এবং ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে ‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি’। তিনি মনে করেন, ধর্ম মানুষকে সত্যের পথে, কল্যাণের, পথে, পারস্পরিক মমতার পথে নিয়ে এসেছে; কিন্তু ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দিয়েছে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এ কারণে মানুষের মন আলোড়িত, জাগ্রত ও বিকশিত তো হয়ইনি বরং দিন দিন হয়েছে দুর্বল, সংকীর্ণ এবং ভীত। স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণির লোক যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ভণ্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আঘাত তার বিরুদ্ধে। লেখক সামাজিক এই বাস্তবতার চিত্রটিই এঁকেছেন ‘লালসালু’ উপন্যাসে; উন্মোচন করেছেন প্রতারণার মুখোশ।

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে রচিত একটি সার্থক শিল্পকর্ম ‘লালসালু’ উপন্যাস। এর বিষয় নির্বাচন, কাহিনি ও ঘটনাবিন্যাস গতানুগতিক নয়। এতে প্রাধান্য নেই প্রেমের ঘটনার, নেই প্রবল প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বসংঘাতের উত্তেজনাকর ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে চমক সৃষ্টির চেষ্টা অথচ মানবজীবনের প্রকৃত রূপ আঁকতে চান তিনি। মানুষেরই অন্তর্ময় কাহিনি বর্ণনা করাই লক্ষ্য তাঁর। ফলে চরিত্র ও ঘটনার গৃঢ় রহস্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁকে দেখাতে হয়েছে যা জীবনকে তার অন্তর্গত শক্তিতে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে। যে ঘটনা বাইরে ঘটে তার অধিকাংশেরই উৎস মানুষের মনের লোভ, ঈর্ষা, লালসা, বিশ্বাস, ভয়, প্রভূত্ব কামনাসহ নানারূপ প্রবৃত্তি। বাসনাবেগ ও প্রবৃত্তি মানুষের মনে সুপ্ত থাকে বলেই বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা ঘটাতে তাকে প্ররোচিত করে। ধর্ম-ব্যবসায়ীকে মানুষ ব্যবসায়ী হিসেবে শনাক্ত করতে না পেরে ভয় পায়। কারণ, তাদের বিশ্বাস লোকটির পেছনে সক্রিয় রয়েছে রহস্যময় অতিলৌকিক কোনো দৈবশক্তি। আবার ধর্ম- ব্যবসায়ী ভণ্ড ব্যক্তি যে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে তা নয়, তার মনেও থাকে সদা ভয়, হয়ত কোনো মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বুদ্ধির মাধ্যমে তার গড়ে তোলা প্রতিপত্তির ভিত্তিটাকে ধসিয়ে দেবে। নরনারীর অবচেতন ও সচেতন মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই এভাবে লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে ‘লালসালু’ উপন্যাসে।

(সংগৃহীত)